



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 916 - 920

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ঋত্বিক ঘটকের নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যা

গনেশ কর্মকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: ganeshkarmakar503@gmail.com

 0009-0005-8870-4946

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Ritwik
Ghatak,
Drama,
Refugees,
Partition,
Bengali
Identity,
Trauma.

Abstract

The Partition of India in 1947 resulted in a massive social and humanitarian crisis, displacing millions and severing people from their homeland, culture, and identity. In Bengali cultural history, the trauma of displacement found one of its most powerful artistic expressions in the works of Ritwik Ghatak. Although primarily known as a filmmaker, Ghatak's plays offer a profound engagement with the refugee experience shaped by his personal history of displacement.

This paper examines the representation of the refugee problem in Ghatak's plays, analysing its social, psychological, political, and cultural dimensions. It explores how post-Partition Bengali existential crisis, memory, nostalgia, and class conflict are articulated through his distinctive dramaturgy. Influenced by the Indian People's Theatre Association, Ghatak's dramatic style combines political commitment with symbolic expression, transforming the refugee figure into a site of protest rather than passive suffering. The study argues that Ghatak's plays function as critical cultural documents that challenge the historical and ethical consequences of Partition.

Discussion

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা একটি গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটের শিল্পরূপ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ কেবল ভৌগোলিক সীমানার পুনর্বিন্যাস নয়, এটি ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, স্মৃতি, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের উপর নেমে আসা এক নির্মম বিপর্যয়। বিশেষত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনে এই বিপর্যয় উদ্বাস্তু সমস্যার রূপ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বহমান থাকে। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং একাধিক নাট্যকার তাঁদের সৃষ্টিতে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদকে শিল্পরূপ দিতে ব্রতী হন। এই ধারার অন্যতম প্রধান ও ব্যতিক্রমী শ্রষ্টা হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও নাট্যকার ঋত্বিক ঘটক। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ওপার বাংলার সন্তান। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকার ঋষিকেশ দাস লেনের ঝুলনবাড়িতে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি এক সাংস্কৃতিক ও চিন্তাশীল পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ তাঁর জীবন ও শিল্পীসত্তাকে আমূল বদলে দেয়। অন্যান্য অগণিত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু পরিবারের মতো ঋত্বিক ঘটকের পরিবারকেও

জন্মভূমি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে হয়। এই বাস্তবচ্যুতির অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে নিছক ব্যক্তিগত স্মৃতি হয়ে থাকেনি; বরং তা তাঁর শিল্পচিন্তার কেন্দ্রীয় প্রেরণায় পরিণত হয়। উদ্বাস্ত হওয়া মানে শুধু ঘরছাড়া হওয়া নয়— এই উপলব্ধি তাঁর নাটক ও চলচ্চিত্রে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তারই ফসল তাঁর রচিত নাটক এবং পরিচালিত চলচ্চিত্র।

পরাদেশী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর এবং দেশভাগজনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ঋত্বিক ঘটকের মানসগঠনে গভীর ছাপ ফেলে। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন কীভাবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতার রাজনীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি নাটককে নিছক বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; বরং নাটককে তিনি সামাজিক অবক্ষয়, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক শাণিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি নাট্যচর্চাকে গণমানুষের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং বিশ্বাস করেন— ‘নাটকের জন্য নাটক নয়, মানুষের জন্য নাটক’।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দেশভাগ ও উদ্বাস্ত সমস্যা নিয়ে রচিত নাটকগুলির মধ্যে ঋত্বিক ঘটকের নাটকগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এখানে উদ্বাস্ত মানুষ কেবল করুণার পাত্র নয়, বরং ইতিহাসের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানো এক প্রতিবাদী সত্তা। তাঁর নাটকে উদ্বাস্ত জীবনের দুঃখ, ক্ষুধা, বেকারত্ব ও অপমান যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান। ‘দলিল’ নাটকে দেশভাগজনিত উদ্বাস্ত জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে; ‘জ্বালা’ নাটকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়; আর ‘সাঁকো’ নাটকে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে বিভাজনের বিরুদ্ধে মানবিক সেতুবন্ধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

ঋত্বিক ঘটকের নাটকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প কখনও শ্রেণি-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই তাঁর নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা কেবল মানবিক বেদনার আখ্যান হয়ে ওঠে না; তা হয়ে ওঠে শ্রেণি-সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার এক তীব্র দলিল। উদ্বাস্ত শ্রমিক, বেকার যুবক, নিঃস্ব পরিবার— এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে ওঠে। অতএব বলা যায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্ত সমস্যা নিয়ে যাঁরা নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক এক অনন্য ও অপরিহার্য নাম। জন্মসূত্রে অপর বাংলার সন্তান হওয়ায় দেশভাগের ক্ষত তাঁর শিল্পে ছিল ব্যক্তিগত ও গভীর; আর গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে সেই ক্ষত রূপ নিয়েছে প্রতিবাদী নাট্যভাষায়। তাঁর নাটকগুলি আজও দেশভাগ-পরবর্তী বাঙালি সমাজের সংকট ও সংগ্রাম বোঝার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য পাঠ হিসেবে বিবেচিত।

চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সাহিত্য জগতেও অবাধে বিচরণ ছিল এই বিচক্ষণ মানুষটির। তাঁর প্রথম নাটক ‘কালোসায়র’ ১৯৪৮ সালে রচিত। আর শেষ নাটক ‘জ্বলন্ত’ রচনা করেছিলেন মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৭৫ সালে। মৌলিক নাটকের পাশাপাশি তিনি অনুবাদ নাটকও রচনা করেছেন। মৌলিক অনুবাদ মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটকের নাটকের সংখ্যা নয়। নিচে তাঁর নাটকের তালিকা তুলে ধরা হল—

মৌলিক নাটক : ‘কালোসায়র’ (১৯৪৮), ‘জ্বালা’ (১৯৫০), ‘দলিল’ (১৯৫২), ‘সাঁকো’ (১৯৫৪), ‘সেই মেয়ে’ (১৯৬৯), ‘জ্বলন্ত’ (১৯৭৫)।

অনুবাদ নাটক : ‘অফিসার’ (১৯৫২), ‘গ্যালিলিও চরিত’ (১৯৬৪), ‘খড়ির গণ্ডি’ (১৯৬৫)।

দেশভাগ-পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যে উদ্বাস্ত সমস্যার যে গভীর ও রাজনৈতিক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়, তার অন্যতম শক্তিশালী দৃষ্টান্ত হল ঋত্বিক ঘটকের ‘দলিল’ নাটক। এই নাটক সম্পর্কে ড. ঘোষ বলেছেন –

“এই নাটকের বিষয় স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলা তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অগণিত হিন্দু নরনারী প্রাণ ও ধর্মরক্ষার তাগিদে তাদের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে জলের স্রোতের মতো পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধাবিত হন।”

ঋত্বিক ঘটক এই নাটকের মাধ্যমে দেশভাগজনিত উদ্বাস্ত জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণা, অপমান ও অস্তিত্বসংকটকে নিছক আবেগের স্তরে না রেখে ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নাটকটির নামকরণই ইঙ্গিতবহ— ‘দলিল’ এখানে কেবল নাটক নয়, বরং একটি সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক সাক্ষ্য। ‘দলিল’ নাটকের মূল প্রেক্ষাপট হল ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তদের জীবনসংগ্রাম। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ একদিনে তাদের ভিটেমাটি, পেশা ও সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ‘রিফিউজি’, ‘ছিন্নমূল’ বা ‘উদ্বাস্ত’ নামে চিহ্নিত হয়। ঋত্বিক ঘটক নিজে এই বাস্তবতার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হওয়ায় ‘দলিল’-এ উদ্বাস্ত জীবনের চিত্র অত্যন্ত বাস্তব, তীব্র ও নির্মম হয়ে উঠেছে। ‘দলিল’ নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা কেবল বাস্তব হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মপরিচয়ের গভীর সংকট। নাটকের চরিত্ররা নতুন ভূখণ্ডে এসে নিজেদের ‘অপর’ হিসেবে আবিষ্কার করে। জন্মভূমি হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন সমাজে অবাঞ্ছিত হওয়ার যন্ত্রণা। এই নাটকে উদ্বাস্ত মানুষের খাদ্য, বাসস্থান ও কাজের সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সামাজিক অবজ্ঞা ও রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার চিত্র। ঋত্বিক ঘটক দেখিয়েছেন, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলেও উদ্বাস্ত মানুষের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। ‘দলিল’ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর রাজনৈতিক অবস্থান। ঋত্বিক ঘটক এখানে দেশভাগকে একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা হিসেবে মেনে নেননি; বরং তিনি একে ক্ষমতার রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ফল হিসেবে দেখিয়েছেন। নাটকের সংলাপ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রশ্ন তুলেছেন— কার স্বার্থে বাংলা ভাগ হল, আর কেন তার মূল্য দিতে হল সাধারণ মানুষকে? নাটকের শেষে উচ্চারিত বিখ্যাত বক্তব্য—

“দ্যাখো, কলকাতায় সেই যে দাঙ্গা বেঁধেছিল খুব বড়ো, সেই সময় এইরকম দেখেছিলাম। মানুষ মরাটা এখানে কেমন যেন স্বাভাবিক হয় গেছে। বাঁচাটাই আশ্চর্য! জন্মানোটাই আশ্চর্য!”^২

উদ্বাস্ত মানুষের ভাঙা হৃদয়ের মধ্যেও অখণ্ড বাঙালি সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

‘দলিল’ নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল শ্রেণি-চেতনা। ঋত্বিক ঘটক দেখিয়েছেন, উদ্বাস্ত জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত এসে পড়ে শ্রমজীবী ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের উপর। যাঁদের পুঁজি বা রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, তাঁদের কাছে দেশভাগ মানে চরম নিঃস্বতা। নাটকে উদ্বাস্ত চরিত্ররা প্রায়শই বস্তিজীবন, অস্থায়ী কাজ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে আবদ্ধ। এই বাস্তবতা নাটকটিকে কেবল মানবিক ট্রাজেডি নয়, বরং একপ্রকার সামাজিক প্রতিবাদে পরিণত করেছে।

নাট্যরীতির দিক থেকেও ‘দলিল’ গুরুত্বপূর্ণ। ঋত্বিক ঘটক এখানে গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাবিত নাট্যভাষা ব্যবহার করেছেন। সংলাপগুলো বক্তব্যধর্মী, তীক্ষ্ণ ও সরাসরি। নাটকের কাঠামোতে আবেগের চেয়ে যুক্তি ও প্রতিবাদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। নাট্যকার নাটককে ‘কথা বলার’ নয়, ‘বক্তব্য রাখার’ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সার্বিকভাবে বলা যায়, ঋত্বিক ঘটকের ‘দলিল’ নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যে উদ্বাস্ত সমস্যার এক শক্তিশালী শিল্পরূপ। এটি কেবল দেশভাগের ইতিহাস নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের এক জীবন্ত দলিল। ‘দলিল’ নাটকের মাধ্যমে ঋত্বিক ঘটক উদ্বাস্ত মানুষকে ইতিহাসের প্রান্ত থেকে তুলে এনে নাট্যক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছেন— এটাই এই নাটকের সর্বাধিক তাৎপর্য।

দেশভাগ-পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যে উদ্বাস্ত সমস্যার যে বহুমাত্রিক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়, তার একটি তীব্র ও ব্যতিক্রমী নিদর্শন হল ‘জ্বালা’ নাটক। এই নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা সরাসরি ভৌগোলিক বাস্তবচ্যুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় এবং মানসিক হতাশার বিস্তৃত পরিসরে রূপ নিয়েছে। ঋত্বিক ঘটক ‘জ্বালা’ নাটকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের সেই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে উদ্বাস্ত জীবন ক্রমশ মৃত্যুমুখী হয়ে ওঠে। ‘জ্বালা’ নাটকটি রচিত হয় ১৯৫০ সালে— এক এমন সময়, যখন কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে উদ্বাস্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। নাটকের চরিত্ররা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এলেও তাদের সকলের অভিজ্ঞতা এক জায়গায় মিলিত— তারা সবাই শোষিত, বঞ্চিত ও হতাশ। এই চরিত্রগুলির অধিকাংশই

জীবনের কোনও আশ্রয় না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এখানে আত্মহত্যা কোনও ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়; বরং একটি বিকল সামাজিক ব্যবস্থার নির্মম পরিণতি হিসেবে নাট্যকার তা তুলে ধরেছেন।

‘জ্বালা’ নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। নাটকের চরিত্ররা কর্মহীন, ক্ষুধার্ত এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। উদ্বাস্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বস্তিজীবন, নিম্নবৃত্তির কাজ এবং চরম অপমান। নাট্যকার দেখিয়েছেন, স্বাধীন রাষ্ট্রে জন্ম নিয়েও এই মানুষগুলো বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে তাদের জীবনে জমে ওঠা ক্ষোভ ধীরে ধীরে আত্মবিনাশী হয়ে ওঠে।

এই নাটকে মানসিক ট্রমার চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরিত্ররা জীবিত থেকেও যেন মৃত— তাদের ভবিষ্যৎ নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই। নাটকের মৃত চরিত্রদের আত্মিক উপস্থিতি এক গভীর প্রতীকী অর্থ বহন করে। তারা সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চেয়েও জীবিত অবস্থায় সেই ভাষা খুঁজে পায়নি। মৃত্যুর পরেও তারা শান্তি পায় না— এটাই উদ্বাস্ত জীবনের চরম পরিণতির ইঙ্গিত। তবে ‘জ্বালা’ নাটক কেবল হতাশা ও আত্মহত্যার দলিল নয়। নাটকের শেষে নাট্যকার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন। পাগল চরিত্রটির মুখ দিয়ে উচ্চারিত বাণী — একলা লড়াই নয়, প্রয়োজন সম্মিলিত সংগ্রাম— নাটকের মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করে। উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত পলায়নে নয়, বরং সামাজিক চেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামে নিহিত— এই বার্তাই ‘জ্বালা’ নাটকের কেন্দ্রীয় উপলব্ধি।

‘সাঁকো’ নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যে দেশভাগ ও উদ্বাস্ত সমস্যার এক ভিন্নতর রূপায়ণ। এখানে উদ্বাস্ত সংকট সরাসরি বস্তিজীবন বা অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বিস্তৃত হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং মানবিক সম্পর্কের ভাঙনের পরিসরে। ‘সাঁকো’ নাটকের সময়সীমা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ অর্থাৎ দেশভাগ-পূর্ব দাঙ্গা থেকে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্ত বাস্তবতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নাটকের গঠনই প্রতীকী। ‘এপার’ ও ‘ওপার’— এই দুই প্রবাহের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ভৌগোলিক ও মানসিক বিভাজনকে তুলে ধরেছেন। দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্ত সংকট সৃষ্টি হয়, তা কেবল ঘরছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা নয়; বরং মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহাকে উসকে দেয়। নাটকের চরিত্র সাগরের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন মানুষ সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার শিকার হয়ে মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে এবং পরে তারই গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়।

‘সাঁকো’ নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা মূলত মানসিক ও নৈতিক সংকট হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশভাগ মানুষকে শুধু ভিটেমাটি থেকে নয়, মানবিকতা থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে — এই উপলব্ধি নাটকের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত। উদ্বাস্ত মানুষ এখানে কেবল নির্যাতিত নয়; কখনও কখনও তারা নিজেরাও নির্যাতনের অংশীদার হয়ে ওঠে। এই জটিল বাস্তবতাকে নাট্যকার অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তসলিম মিঞা ও তাঁর পরিবারের চরিত্রগুলি ‘সাঁকো’ নাটকের মানবিক কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা বাঙালি পরিচয় ও মানবধর্মের কথা বলেন। এই পরিবার উদ্বাস্ত সংকটের বিপরীতে এক মানবিক বিকল্পের ইঙ্গিত দেয়। নাটকের নাম ‘সাঁকো’ তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ— এটি দুই বাংলার মধ্যে নয় শুধু, বিভক্ত মানুষের হৃদয়ের মধ্যেও সেতুবন্ধন রচনার প্রতীক। ‘সাঁকো’ নাটকের উপসংহারে নাট্যকার আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন, সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্রীয় বিভাজন চিরস্থায়ী নয়। মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক, শ্রেণিচেতনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উদ্বাস্ত সংকট ও দেশভাগের ক্ষত অতিক্রম করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি ‘সাঁকো’ নাটককে নিছক দেশভাগের ট্রাজেডি না বানিয়ে এক মানবিক ও রাজনৈতিক প্রত্যাপার নাটকে পরিণত করেছে।

ঋত্বিক ঘটকের উদ্বাস্ত-চেতনা জন্মসূত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত একজন উদ্বাস্ত হিসেবে তিনি উদ্বাস্ত জীবনের আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক অপমান, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং মানসিক ট্রমাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যাকে আবেগনির্ভর করুণা নয়, বরং ইতিহাস-সচেতন ও রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ শিল্পভাষায় রূপ দিয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — তিনি উদ্বাস্ত মানুষকে কখনও নিছক সহানুভূতির পাত্র হিসেবে দেখাননি। ‘দলিল’ নাটকে আমরা দেখি, দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি হারানো মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণা কেবল ব্যক্তিগত বেদনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা রাষ্ট্রীয়

সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতার রাজনীতির প্রত্যক্ষ ফল। নাটকের সংলাপ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেন— বাংলাকে কেটে ভাগ করা গেলেও বাঙালির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবিক বন্ধনকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ঋত্বিক ঘটকের নাটকে সমকালীন নাট্যচর্চা থেকে পৃথক করে। ‘জ্বালা’ নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা আরও বিস্তৃত সামাজিক প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে। এখানে উদ্বাস্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেকারত্ব, ক্ষুধা, আত্মহত্যা ও সামাজিক অবক্ষয়ের ভয়াবহ চিত্র। নাটকের চরিত্রেরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এলেও সবাই একই শোষণমূলক ব্যবস্থার শিকার। ঋত্বিক ঘটক এই নাটকে দেখিয়েছেন— উদ্বাস্ত সমস্যা আসলে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত সংকটেরই অংশ। একা একা লড়াই করে এই সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব নয়; প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ। ‘সাঁকো’ নাটকে ঋত্বিক ঘটক উদ্বাস্ত সমস্যাকে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে মানবিকতার আলোকে বিচার করেছেন। দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া ‘এপার-ওপার’ বিভাজনকে তিনি নাটকের কাঠামোর মধ্যেই প্রতীকী রূপ দিয়েছেন। এই নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভুল বোঝাবুঝি ও রাজনৈতিক স্বার্থপরতার ইতিহাস। তবু নাট্যকার শেষ পর্যন্ত মানবিক সেতুবন্ধনের সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মূল্যবোধ ঋত্বিক ঘটকের নাট্যচিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন হল — ঋত্বিক ঘটকের নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা কখনও স্থির বা অতীতনির্ভর নয়। তাঁর নাটকগুলি ভবিষ্যতমুখী। ‘জ্বালা’-র মতো নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, যদি সমাজ তার মূল্যবোধ হারায়, তবে উদ্বাস্ত সংকট কেবল ভৌগোলিক বাস্তবচ্যুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; তা নৈতিক ও মানবিক উদ্বাস্তত্বের রূপ নেবে। নারী-নির্যাতন, দুর্নীতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সভ্যতার গভীর সংকটকে উন্মোচিত করেছেন, যা দেশভাগের পরিণতিরই বিস্তৃত রূপ।

সবশেষে বলা যায়, ঋত্বিক ঘটকের নাটকে উদ্বাস্ত সমস্যা একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এখানে উদ্বাস্ত মানে শুধু ঘরছাড়া মানুষ নয়; উদ্বাস্ত মানে শোষিত শ্রমিক, নিপীড়িত নারী, আত্মপরিচয়হীন নাগরিক এবং নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত সমাজ। তাঁর নাটক আমাদের শেখায়— উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধান করণায় নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং মানবিক চেতনার পুনর্গঠনে নিহিত। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় তাঁর যমজ বোন প্রতীতি দেবীকে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন –

“তুই যা, আমি আসছি। আসতে তো হবেই। আমাদের জন্মস্থান, মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমার বাবা-মায়ের স্বপ্নের বাংলাদেশ। আমাদের আশৈশবের রাজশাহী। আমার সব স্বপ্নের ফসল বাংলাদেশ। আমার সব ক্রন্দনের অশ্রুধারা বাংলাদেশ। আমাকে যেতেই হবে রো”^৩

এই ছিল তাঁর দেশভূমির প্রতি টান।

অতএব, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঋত্বিক ঘটকের নাটক উদ্বাস্ত সমস্যার এক অনন্য দলিল। এগুলি কেবল একটি বিশেষ সময়ের শিল্পপ্রকাশ নয়; বরং আজও প্রাসঙ্গিক এমন এক প্রতিবাদী নাট্যভাষা, যা আমাদের ইতিহাসকে বুঝতে, বর্তমানকে প্রশ্ন করতে এবং ভবিষ্যতের পথে মানবিকতার সন্ধান দিতে সক্ষম।

Reference:

১. ঘোষ, ড. জগন্নাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃ. ১৮২
২. আনহার, ড. রুবেন (স), ঋত্বিক ঘটকের দলিল, বুক ভিলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১১৮
৩. ঘটক, ঋত্বিক, জ্বলন্ত নাট্যকথা বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ২০০৪